জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

কৃষি-পরাশর-এ প্রাচীন বাংলার কৃষি

মো. হাবিবুল্লাহ*

Abstract

Krisi-parashara is a Sanskrit text written by sage Parashara and its importance lies in the fact that it is the only Sanskrit work that throws light exclusively to the different agricultural operations. The text contains 243 verses. The language of the text and textual structure and nature of the described agriculture indicate that the writer must be a native of Bengal or Eastern India. Scholars opined that it was written in the period between 600-1100 A.D. a date which is certainly very old. In 1960, it was published by the Asiatic Society of Kolkata in Devanagari script with English translation. The manifestation of astrological science and mathematical calculation in regards to agriculture indicates that agriculture was the key concern of study in the contemporary period. At the beginning of the *Krisi-parashara*, the author states that it was written for benefiting the peasantry. In the verses, Sage Parashara have given a vivacious description of every agricultural operation; the objective of agriculture, importance-qualification of farmers, agricultural tools, preservation of seeds, paddy threshing, astrological calculation for rainfall and women etc. But it seems that the information and knowledge of *Krisi-Parasara* couldn't use thoroughly to reconstruct the social history of ancient Bengal. Radharaman Gangopadhyay (1932), Lallanji Gopal (1965), D.K. Ganguli (2008) made extensive use of Krsi-Parasara in their works but there are few endeavours to write the social history of ancient Bengal. In this context, this article is aimed to manifest the state of agriculture in ancient Bengal and throw some light on the social history of Bengal.

ভূমিকা

মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কীর্তিকলাপের সাথে তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।[১] বাংলার এই অবস্থান এবং পরিবেশ নীহাররঞ্জন রায় চিহ্নিত করেছেন, "একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুইদিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য- এটাই বাঙালীর ভৌগোলিক ভাগ্য"।[২] ভারত সভ্যতা চিরদিনই মূলত কৃষিভিত্তিক, উপরন্তু বাংলার গাঙ্গেয় বদ্বীপ বেষ্টিত উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত নতুন সমভূমি, পানির সহজলভ্যতা এবং কৃষিতে প্রযুক্তির সন্নিবেশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে টেকসই আবাসভূমি হিসেবে একে এতদঞ্চলে একটা বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে। বাংলার কৃষির ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে প্রাচীন কালের শেষ সময় পর্যন্ত ভৌত নিদর্শন ও সাহিত্যসূত্রে বাংলার কৃষি কাজের যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ধানকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা আবর্তিত হতো, ধান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শস্যগুলির একটি। পাণ্ডুরাজার ঢিবি বাংলা অঞ্চলের প্রথম তাম্র-প্রস্তরযুগীয় প্রত্নস্থল, পর্যায়ক্রমে এখানে ৭৬টি তাম্র-প্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল পাওয়া গেছে, শ্যামচাঁদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গের তাম্র-প্রস্তরযুগীয় প্রত্নস্থলগুলির অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ থেকে মনে করেন যে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সে সময়ে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নদীতীরস্থ কৃষিসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।[৩] শুধু ভাত না, একই সাথে মাংস, মাছ এবং ফলমূলও তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে ধানের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।[৪] পরবর্তিকালে *রঘুবংশ*[৫], *রামচরিতম*[৬] ও *সদুক্তিকর্ণামৃত* প্রভৃতি সাহিত্যিক রচনায় ধানের উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*[৭] ও বরাহমিহিরের *বৃহৎসংহিতায়* কৃষি বিষয়ক আলোচনা স্থান

* প্রভাষক, ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল

পেয়েছে। বিশ্বকোষ ও স্মৃতিজাতীয় কিছু গ্রন্থেও কৃষি বিষয়ক কিছু আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, যেমন- *শুক্রনীতি*, *শিকতত্ত্ব রত্নকর* ও *মানসোল্লাস* অন্যতম গ্রন্থ। লৌহের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে মৌর্যযুগে বাংলায় ধান চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।[৮] প্রাচীন যুগে বাংলার শেষ রাজনৈতিক শক্তি সেনদের সময়ের বিভিন্ন শিলালিপিতে (অনলিয়া, ইদিলপুর[৯] প্রভৃতি) বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে বাংলার প্রচীন যুগের শেষ অবধিও কৃষি বিষয়ে বিশদ ধারণা লাভের পক্ষে উৎসের স্বল্পতা রয়েছে, বিশেষভাবে লিখিত উৎসের।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক উপকরণ ও ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপিসমূহের আলোকে প্রাচীন বাংলার কৃষি বিবরণ জানা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। এ অবস্থায় ঋষি পরাশর রচিত *কৃষি-পরাশর* প্রাচীন যুগের কৃষির স্বরূপ সন্ধানে এক অন্যতম ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কেননা *কৃষি-পরাশরে* কেবল কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলেও *কৃষি পরাশর*-এর ভাষা এবং বর্ণনায় যে-প্রকৃতির কৃষির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ঋষি পরাশরকে বাঙালি বা পূর্ব ভারতীয় মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।[১০] সুতরাং *কৃষি-পরাশর*-এর ২৪৩টি শ্লোকে কৃষিকাজের নানা পর্বে যে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা এবং কৃষি বিষয়ক যে জটিল, অংকবাচক তত্ত্ব এবং প্রযুক্তির আলোচনা করা হয়েছে তাতে মূলত বাংলার কৃষির-ই স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের প্রাক-মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনকালে লালানজি গোপাল[১১] (১৯৮৯) সমকালীন কৃষিপ্রযুক্তির আলোচনায় *কৃষি পরাশর*-এর তথ্য ব্যবহার করেছেন। এ.কে. চৌধুরী[১২] (১৯৭১) তাঁর কৃষিচর্চার রীতিনীতি এবং বার্ষিক কৃষিচক্র সংক্রান্ত গবেষণায় *কৃষি-পরাশর* ছিল একটি শক্তিশালী উৎস। গুলা ওজটিলা[১৩] (১৯৯৭) *কৃষি-পরাশরের* গ্রাম-সম্প্রদায় সম্পর্কিত তথ্যাদির স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। রুয়ুসুকে ফুরুই[১৪] (২০০৫) তাঁর *কৃষি-পরাশর* সম্পর্কিত গবেষণায় বাংলার সমকালীন গ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে *কৃষি-পরাশর*-এর আলোকে প্রাচীন বাংলার সমকালীন কৃষির স্বরূপ অন্বেষণ করা হবে। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে এর রচনাকাল, উৎপত্তিগত অঞ্চল এবং কাঠামো সম্পর্কিত আলোচনা থাকবে, ২৪৩টি শ্লোকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পরবর্তী অংশের দ্বিতীয় অংশে সমকালীন কৃষিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রগত প্রভাব, তৃতীয় অংশে কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, প্রত্যেক কৃষিজাত কাজের নির্দেশনা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা এবং শেষ অংশে সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে *কৃষি-পরাশর* এর নৈর্ব্যক্তিকতা এবং সংক্ষেপে তৎকালীন কৃষির স্বরূপ সন্ধানের পাশাপাশি কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক ইতিহাস রূপায়ণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

কৃষি-পরাশর: রচনাকাল, উৎপত্তিগত অঞ্চল এবং কাঠামো

বাংলায় মানববসতির আদিকাল থেকে কৃষিকে কেন্দ্র করেই জীবন-জীবিকা বিকশিত হয়েছে। কৃষি প্রধান অঞ্চল হিসেবে, কৃষিভিত্তিক লিখিত উপাদানের প্রাচুর্য থাকা স্বাভাবিক হলেও তেমন কোন নির্ভরযোগ্য লিখিত উপাদান পাওয়া যায় না। যে দু-চারটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তার মধ্যে *কৃষি-পরাশর* অন্যতম। *কৃষি-পরাশর* অতি সাধারণ এবং বোধগম্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। এটি মূলত সরলমতি ও অল্পবিস্তর শিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হয়েছে।[১৫] এই গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেছেন সাধারণ অব্দের চতুর্থ শতাব্দী, আবার কেউ কেউ বলেছেন সাধারণ অব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তী এবং সাধারণ অব্দের দশম বা একাদশ শতাব্দী। লেখক ঋষি পরাশর এই গ্রন্থে বিশেষভাবে দুটি উৎসের উল্লেখ করেছেন, মনু এবং গার্গ। সুতরাং অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে এর রচনাকাল নির্ধারণ অযৌক্তিক বলে পরিগণিত হবে যেহেতু তখনও পর্যন্ত মূল ধর্মশাস্ত্রসমূহই রচিত হয়নি। আবার এই গ্রন্থের রচনারীতির সাথে অষ্টম শতাব্দীপরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের রচনারীতির সাথে সামঞ্জস্য নেই। পরাশর নামটির সাথেও এর রচনাকালের একটি যোগ আছে, যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ধর্মশাস্ত্রকারদের নামের তালিকায় পরাশর নামটির উল্লেখ আছে, সেই

পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় তিনি অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যর পূর্বের কেউ হবেন। অর্থাৎ ১০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে তার জীবনকাল হওয়ার কথা, যদি *কৃষি-পরাশরের* লেখক পরাশর উল্লিখিত একজন ধর্মশাস্ত্রকার হন। *কৃষি-পরাশর* গ্রন্থের কিছু শ্লোক প্রাচীন বাংলার সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত রঘুনন্দনের সংকলনসমূহে পাওয়া যায়। রঘুনন্দন এই শ্লোকসমূহ *রাজামার্তণ্ড* এবং *বরাহ্* থেকে সংকলন করেছেন। পি ভি কেন[১৬] তাঁর 'History of Dharmasastra' গ্রন্থে *রাজামার্তণ্ড* গ্রন্থটি ধারার রাজা ভোজা কর্তৃক লিখিত বলে মত দিয়েছেন যার সম্ভাব্য কাল ১০০০-১০৫৫ সা. অব্দ। এখন এই উৎস এবং উপাত্তের আলোকে এটা প্রতীয়মান হয় যে যদি ঋষি পরাশর থেকে রঘুনন্দন বা রঘুনন্দন থেকে ঋষি পরাশর যে-ই ধার করে থাকুন না কেন, *কৃষি-পরাশর*-এর লেখক ৯৫০-১১০০ সাধারণ অব্দের মধ্যেই এটা সংকলন করেছেন। একইভাবে বরাহমিহিরকে[১৭] পৌরাণিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্যতম পুরোধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের ছিলেন সে বিষয়ে গবেষকরা কিছুটা বিতর্ক সত্ত্বেও একমত হয়েছেন। এখন বরাহমিহির থেকে যদি ঋষি পরাশর সংকলন করে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই তার সময়ের বেশ পরেই সংকলন করেছেন, সেটা ৭ম শতাব্দী বা তৎপরবর্তী শতকসমূহে করেছেন বলে ধারণা করা যায়। অন্যদিকে যদি বিপরীত হয়, তাহলে ঋষি পরাশর গোড়ার দিকের সাধারণ শতকসমূহের পণ্ডিত এবং *কৃষি-পরাশর* এই সময়টাতে রচিত হয়েছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতদের মত এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এবং সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Krisi-Parasara* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন 'Thus, inspite of the lack of conclusive evidence, we may say that the author was perhaps earlier than the 6th century A.D., and, by no means, later than the 11th'.[১৮] ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের মাধ্যমে রচিত এই সংহিতার রচয়িতা হয়তো ষষ্ঠ শতাব্দীর আগের মানুষ নতুবা অবশ্যই ১১ শতাব্দীর আগের হবেন। যোগেশচন্দ্র রায় অবশ্য *কৃষি-পরাশর* এর রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। লালানজি গোপাল[১৯] তাঁর প্রবন্ধে ১১ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হয়েছে বলে মত দিয়েছেন। রুয়ুসুকে ফুরুই এই গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ তথ্য-উপাত্ত ব্যাখ্যা করে লালানজি গোপালের মতের সাথে সহমত জ্ঞাপন করেছেন, তিনি প্রাপ্ত তথ্য এবং উৎসের আলোকে এখনও পর্যন্ত এটা ১১ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।[২০]

গ্রন্থটির তারিখ নির্ধারণ বেশ কষ্টসাধ্য হলেও এটার উৎপত্তির স্থান নিয়ে গবেষকরা মোটামুটিভাবে একমত। যদিও *কৃষি-পরাশর*-এর লেখক পরিচিতি অথবা অন্য কোনো লিখিত/অলিখিত উৎস পাওয়া যায় না তথাপি এই গ্রন্থে ফুটে ওঠা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন স্থানিক পদ্ধতি, কৌশল, বিশ্বাস এবং জ্যোতিষ জ্ঞান ও ভাষার আঞ্চলিক নিশানাদি, প্রথা এবং কুসংস্কার বিশ্লেষণ করলে এটা যে বাংলায় রচিত তার প্রমাণ মিলে। প্রাচীন ভারতে মহিষ, ঘোড়াসহ বিভিন্ন গৃহপালিত জন্তু দিয়ে চাষাবাদ করার প্রমাণ থাকলেও এই গ্রন্থের ৮৪-১১৯ পর্যন্ত শ্লোকসমূহের শুধুমাত্র ষাঁড় বিষয়ক তথ্য এবং ষাঁড় দিয়ে চাষাবাদ করার কথা বলা হয়েছে। এখান থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, যেহেতু চাষাবাদে ষাঁড়ের ব্যাপক ব্যবহার শুধুমাত্র বাংলা অঞ্চলে হয়ে থাকে সেহেতু এটাতে প্রকৃতপক্ষে বাংলা অঞ্চলের কৃষি বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি এই সংস্কৃত গ্রন্থে কিছু দেশি শব্দের ব্যবহার এই প্রস্তাবকে আরও বেশি পূর্ণতা প্রদান করে, যেমন 'মাদিকা' বা 'মই' 'প্রজনিকা' বা 'পাকান/পাজান' 'কাট্টানাম' বা 'কাটানো'। উল্লিখিত শব্দসমূহ মূলত বাংলার আঞ্চলিক শব্দ, এদের প্রচুর ব্যবহার বাংলায় বা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দৃষ্ট হয়। ভৌগোলিক বিবরণ বা প্রকৃতিনির্ভর কৃষিব্যবস্থার যে বিবরণ *কৃষি-পরাশর*-এ উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেও এর উৎপত্তি সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করা যায়। অনেক শ্লোকে মাসকেন্দ্রিক মেঘের পূর্বাভাস এবং সেচের জন্য বৃষ্টি নির্ভরতার কথা বার বার উঠে এসেছে। মৌসুমি জলবায়ুর এই অঞ্চলে কৃষিব্যবস্থা এখনও বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন ঋগবেদ, অর্থশাস্ত্র এবং শুক্রনীতিতে কৃষিকাজে সেচবিষয়ক অনেক পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও এই গ্রন্থে শুধুমাত্র

বৃষ্টিনির্ভরতার কথা উল্লেখিত হয়েছে যা এর উৎপত্তির ভৌগোলিক প্রমাণ। উপরন্তু গরম লোহার সেঁক দিয়ে পশুকে চিহ্নিত করা এবং শরীর ও লেজের পশম কাটার যে প্রথা সেটা আবহমানকাল ধরে বাংলায় বিদ্যমান। উপর্যুক্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এটা আসলে পূর্ব ভারতের ধান প্রধান পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলসমূহকে নির্দেশ করছে।

কৃষি পরাশর-এর প্রথম ৯টি শ্লোকে কৃষি ও কৃষকের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পরবর্তী ৭০টি শ্লোকে মাসভিত্তিক মেঘের পরিচয়, বৃষ্টিপাতের ধরন এবং পরিমাপ উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষিকাজ ও গৃহস্থালি কাজের বিভাজন এবং কৃষিকাজে কারা নিযুক্ত হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ৮০-৮৩ নম্বর শ্লোকে। এরপর ৮৪-১১১ নম্বর পর্যন্ত শ্লোকে ভারবাহী পশু সম্পর্কিত নিয়মকানুন, গোপূজা সম্বন্ধীয় বিবরণ, গবাদি পশুর যাত্রা ও প্রবেশ এবং গরুর গোবর সম্পর্কিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ১১২-১২০ পর্যন্ত শ্লোকে লাঙলের যন্ত্রাংশের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। কৃষিপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণসহ কৃষিকাজে নানা ধরনের রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ১২১-২১৩ নম্বর শ্লোকে। পরবর্তী শ্লোকসমূহে মেধি স্থাপন, মেধির কাঠ ও সময় নির্ধারণ, আরাধনা, ফসল পরিমাপ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সমকালীন কৃষিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাব এবং কৃষি বিষয়ক লৌকিক বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনাচরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বাংলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বরাহমিহির যে প্রাচীন ভারতের জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞানের পুরোধা ছিলেন, সেটি নিয়ে গবেষকরা মোটামুটিভাবে একমত। পূর্বের আলোচনার আলোকে ঋষি পরাশর যদি বরাহমিহিরের অগ্রগামী বা অনুগামী যাই হয়ে থাকেন না কেন, ঋষি পরাশর-ও ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ছিলেন একথা *কৃষি-পরাশরের* জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে নির্দ্বিধায় অনুমান করা যায়। *কৃষি-পরাশর*-এর শুরুতে প্রথম থেকে নবম শ্লোক পর্যন্ত তিনি কৃষিকাজের আবশ্যকতা সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করেই বৃষ্টিপাত সম্পর্কে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় জ্ঞানের নির্দেশ করেছেন। এই গ্রন্থটি তিনি কৃষকের হিতার্থে এবং কৃষিকাজের মঙ্গলের নিমিত্তে রচনা করেছেন[২১] কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিমাণিক্য ইত্যাদি সম্পদের ও প্রাচুর্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী[২২] থেকে দেবতা, দানব কিংবা মানবকূল সকলেই অন্নের জন্য কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। দেবতার আর্শিবাদপুষ্ট এই কৃষিকাজ পবিত্র; কৃষিই সমগ্র জীবগণের জীবন আর এই সমগ্র কৃষিকাজে বৃষ্টিপাতই মূল কথা।[২৩] বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কৃষিতে তেমন সেচের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাব ছিল না, এজন্য বাংলার কৃষি ছিল বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। *কৃষি-পরাশর* এ বৃষ্টিনির্ভর কৃষির উল্লেখ এবং কৃষিতে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪] ১১ নম্বর শ্লোকে বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট বছরের দেবতার রাজা ও অমাত্য এবং মেঘ ও জলের পরিমাণ মাপক 'আধক' সম্পর্কে বিদ্যার্জনে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখন এই দেবতার রাজা ও অমাত্য সম্পর্কিত বিবরণ তিনি সংখ্যাতত্ত্বের পরবর্তী দশটি শ্লোকে প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট বছরের দেবতার রাজা বের করার সূত্রের প্রসঙ্গে তিনি ১২ নম্বর শ্লোকে বলছেন যে 'শক' বৎসরকে ৩ দিয়ে গুণ করে ২ যোগ করে তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করে যে অবশেষ পাওয়া যাবে তিনিই রাজা, সংখ্যাতত্ত্বে রাজা থেকে চতুর্থ সংখ্যা হবে মন্ত্রী বা অমাত্য। সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে দেবতার রাজা নির্ণয় করার পর, নিম্নোক্তভাবে বৃষ্টিপাত হবে।

ক্র.	দেবতার রাজা	বৃষ্টিপাতের মাত্রা	সার্বিক পরিস্থিতি
১	সূর্য	মধ্যম	যে সংবছরে সূর্য রাজা, সে বছরে চক্ষুরোগ, জ্বরাদি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা স্বল্পবৃষ্টি ও প্রবল বায়ু প্রবাহের আধিক্য

			থাকবে।
২	চন্দ্র (রাত্রি দেবতা)	অতিবৃষ্টি	নীরোগ, প্রচুর শস্যাদি, সকলের নিমিত্ত সুখ অর্জিত হবে।
৩	মঙ্গল	অল্পবৃষ্টি	বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে, শস্যাদি বিনষ্ট হবে, পৃথিবীতে শস্যাভাব লক্ষিত হবে।
৪	বুধ (চন্দ্রের সন্তান)	সর্বোত্তম বৃষ্টিপাত	রোগ-ভয়হীন বছর, শস্যে প্রাচুর্য থাকবে।
৫	বৃহস্পতি	উত্তম বৃষ্টিপাত	সর্বোত্তম বৃষ্টিপাতের জন্য বসুন্ধরা হবে শস্য-শ্যামলা।
৬	শুক্র (দৈত্যগুরু)	সর্বোত্তম বৃষ্টিপাত	সর্বসময়ে বহু রাজন্যকে সম্পদশালী করেছেন। শস্যের প্রাচুর্য পৃথিবীকে সম্পদশালী করবে।
৭	শনি	অনাবৃষ্টি তথা খরা	পৃথিবীতে সংঘর্ষ ও দুর্বিপাক থাকবে, সংবৎসরটি হবে ঝঞ্ঝাসঙ্কুল

*শ্লোক ১৩ থেকে ২১ অবলম্বনে উপরের ছকটি প্রস্তুতকৃত

পরবর্তী ৪১টি শ্লোকে ঋষি পরাশর মেঘ, মেঘের প্রকারভেদ এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট শকাব্দের মাসভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। বৃষ্টির উৎস 'মেঘের আবর্ত' তিনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্লেষণ করেছেন। শক বছরের সাথে তিন যোগ করে চার দ্বারা ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যাবে সেখান থেকে মেঘের আবর্ত শুরু হয়।[২৫] তিনি মেঘকুলকে চারভাগে ভাগ করেছেন, আবর্ত-অঞ্চলকেন্দ্রিক, পুষ্কর-স্বল্প এবং দ্রোণ-প্রচুর বৃষ্টিপাত। তিনি মেঘ ও জলের পরিমাণকে 'আধক' দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। আধকের পরিমাণ নির্দেশে তিনি ঋষিগণের উক্তি অবলম্বনে বলছেন যে আধক ১০০ যোজন চওড়া এবং ৩০ যোজন গভীর[২৬] প্রকৃতির কোন অংশে কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে সে প্রসঙ্গে *কৃষি-পরাশরে* বলা হচ্ছে দেবতা ইন্দ্র মোট বৃষ্টিপাতের দশমাংশ সাগরে, ষষ্ঠাংশ পর্বতে এবং চতুর্থাংশ মৃত্তিকায় দান করেন।[২৭] কৃষিকাজ শুরুর পূর্বে তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোকে সংবছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে কৃষি কাজ শুরুর নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ২৭ এবং ২৮ নম্বর শ্লোকে তিনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যখন সূর্য কর্কটরাশি অতিক্রম করে এবং মিথুন, মেঘ এবং মীনে চন্দ্রের অবস্থান থাকে তখন বৃষ্টিপাত ১০০ আদক হয়, সূর্যধমুতে অর্ধেক বৃষ্টিপাত (৫০ আদক), সূর্য যখন কন্যা এবং বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে তখন ৮০ আদক বৃষ্টিপাত হয়। সূর্যের অবস্থান যখন কর্কট, কুম্ভ, বৃশ্চিক ও তুলা রাশিতে হয় তখন ৯৬ আদক বৃষ্টিপাত হয়। ঋষি পরাশর পরবর্তী ৪০টি শ্লোকে জ্যোতির্জ্ঞান এবং লৌকিক বিশ্বাসের আলোকে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসসমূহে বৃষ্টিপাতের আভাস এবং বৃষ্টিপাতের পরিমানের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

নক্ষত্রের গতিপথের সাথে বৃষ্টিপাতের সম্পর্কের বিষয় বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন, গ্রহের উদয়, অস্ত, পরিবর্তিত গতিপথ, গতিবেগ বৃদ্ধি এবং রাজার উদ্যোগের উপর বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল।[২৮] ৭১ নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন, মঙ্গল এবং শনি এক ক্রান্তিরেখা থেকে অপর ক্রান্তিরেখায় গমন করলে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী এবং বৃহস্পতি যদি পরে পরিভ্রমণ করে তবে পৃথিবী জলপূর্ণ হয়। চিত্রা নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিরাজমান হলে ভাঙাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এটা যখন স্বাতী নক্ষত্রে মিলিত হয় তখন গভীর মেঘ সঞ্চারের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়।[২৯] পুষ্যা নক্ষত্রের পুঞ্জিভূত মেঘকে স্বাতী নক্ষত্রই মেঘমুক্ত করে ও শ্রাবণ মাসে সৃষ্ট মেঘপুঞ্জ রেবতী নক্ষত্রের দ্বারাই মেঘমুক্ত হয়।[৩০] ঋষি পরাশর বৃষ্টিপাতের পূর্ব নির্দেশনা স্বরূপ কিছু লৌকিক বিশ্বাসের উপর আলোকপাতও করেছেন। যেমন জলের ভেতরে বা কাছাকাছি জলস্তম্ভ সৃষ্টি হলে, স্রষ্টার সৃষ্টি রক্ষার্থে অবিলম্বে বৃষ্টিপাত হবে[৩১], যদি বিড়াল, নকুল, সাপ প্রভৃতি প্রাণী গর্ত থেকে নির্গত হয়[৩২] এবং পিঁপড়া যদি তার বাসা থেকে ডিম নিয়ে বাহির হয় অথবা ব্যাঙ যদি হঠাৎ করে ডাকাডাকি শুরু করে।[৩৩] যদি বালকেরা ধুলো দিয়ে রাস্তার উপর ব্রিজ তৈরি করে এবং ময়ূর নৃত্যরত হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বৃষ্টিপাত আসন্ন।[৩৪] মানুষেরা যদি ক্ষত বা বাতের যন্ত্রণায় কষ্ট

পায় এবং সাপ গাছের উপর অবস্থান করে তবে তাৎক্ষণিক বৃষ্টিপাতের সমূহ সম্ভাবনা অথবা যদি জলচর পক্ষীকুল রোদে তাদের ডানা শুকাতে থাকে এবং আকাশে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকতে শুরু করে তবে বৃষ্টিপাত আসন্ন।[৩৫] এই লৌকিক বিশ্বাসসমূহ হাজার বছর ধরে বাংলার কৃষক বিশ্বাস করেছেন, এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি খরা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, যদি মঙ্গল গ্রহ উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাসাধ্যা, উত্তরভাদ্রপাদ, শ্রবণা, হস্তা, মূলা, জেষ্ঠ্য, কৃত্তিকা এবং মঘা নক্ষত্র পরিভ্রমণ করে তাহলে খরা নিশ্চিত।[৩৬] শুক্র চিত্রা নক্ষত্রে থাকলে বৃষ্টিপাত আসন্ন কিন্তু সিংহরাশিতে মঙ্গল অবস্থান করলে পৃথিবীতে অঙ্গারপিন্ডের ন্যায় অনুভূত হয় এবং সূর্যের সংস্পর্শে থাকলে সমুদ্রও শুষ্ক হয়ে যায়।[৩৭]

কৃষিকাজের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ভারবাহী পশু সম্পর্কেও জ্যোতিজ্ঞান ও লৌকিক বিশ্বাসের অবতারণা করেছেন ঋষি পরাশর। তিনি বলছেন, ভারবাহী পশুদের নিপীড়নের মাধ্যমে কোন কৃষক হয়তোবা চারগুণ ফসল উৎপাদন করতে পারবে কিন্তু এই নিপীড়নের দীর্ঘশ্বাসের কারণে তা অচিরেই বিনষ্ট হবে।[৩৮] ভারবাহী পশুর যেন কোনো অযত্ন না ঘটে এজন্য তিনি সুনির্মিত পরিচ্ছন্ন গোশালা নির্মাণের কথা বলেছেন এবং এই গোশালা যদি সিংহরাশিতে সূর্যের উপস্থিতিকালে নির্মিত হয় তাহলে গোকুলের ধ্বংসের কারণ হবে। গোশালায় গবাদি পশুর প্রবেশ ও যাত্রা সর্ম্পকেও তিনি জ্যোতির্জ্ঞানের আলোকে বলছেন যে, পূর্বফাল্গুনী, পূর্বষাঢ়া ও পূর্বভাদ্রপাদ এই ত্রয়ীর ত্র্যহস্পর্শে এবং ধন্বিষ্ঠা, জ্যোষ্ঠা, কৃত্তিকা, মৃগশিরা ও শতভিষা নক্ষত্রের অর্ন্তগত অবস্থায় গোশালায় প্রথমবারের গোযাত্রা ও প্রবেশ খুবই মঙ্গলদায়ক হয়।[৩৯] অন্যদিকে উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপাদ, রোহিণী, শুক্লপক্ষের প্রথম, অষ্টম ও চতুর্দশ দিনে এবং পুষ্যা, শ্রবণা, হস্তা, চিত্রা নক্ষত্রের অবস্থানকালে গবাদি পশুগণের যাত্রা অনুচিত এবং কৃষি বা অন্য কাজে নিযুক্ত করলে গবাদি ও অন্যান্য ছোলাভোজী পশুর ধ্বংস অনিবার্য।[৪০]

সমকালীন কৃষিতে একটি নতুন কৃষিবৎসর শুরু উপলক্ষে জমি চাষ করার নিমিত্তে[৪১] হল প্রসারণ উৎসব তৎকালীন সমাজের একটা বড় অনুষ্ঠান ছিল। বৃষ, মীন, কন্যা, মিথুন, ধনু ও বৃশ্চিকরাশিতে সূর্যের প্রবেশ কালে হল প্রসারণ উৎসব পালন করা কল্যাণকর।[৪২] সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশকালে হল প্রসারণ উৎসব অনুষ্ঠান করলে পশুর ধ্বংস সাধন হতে পারে, কর্কটরাশিতে প্রবেশ কালে জলজ প্রাণী দ্বারা বিপদ ঘটতে পারে, সিংহরাশিতে সর্পভয় এবং কুম্ভরাশিতে চোরের দ্বারা কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে[৪৩], বৃশ্চিকরাশিতে শস্যহানি এবং তুলারাশিতে কৃষকের জীবনহানি ঘটতে পারে।[৪৪] জ্যোতিজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি কিছু লৌকিক ভবিষৎবাণীরও উল্লেখ করেছেন। হল প্রসারণ চলাকালে লাঙল চালানোর সময়ে কচ্ছপ উত্থিত হলে কৃষকের স্ত্রী বিয়োগ এবং অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা থাকে[৪৫], লাঙ্গলের ফাটলের জন্য বলপূর্বক কর্ষণের ফলে স্বীয় ভূমি পরিত্যক্ত হয় এবং লাঙল খণ্ডিত হলে ভূস্বামী ধ্বংসপ্রাপ্ত হন, ইশায় ফাটল হলে কৃষকের প্রাণহানির আশংকা জাগে, যুথা ভেঙে গেলে ভ্রাতৃবিয়োগ ও শৌলা ভেঙে গেলে পুত্রবিয়োগের আশংকা থাকে।[৪৬] অধিকন্তু যোত্র নষ্ট হয়ে গেলে শস্যের রোগ ও শস্যহানির আশংকা থাকে, বৃষ পতিত হলে লোকেরা জ্বর ও আমাশয়ে আক্রান্ত হতে পারে, বৃষ পলায়ন করলে কৃষকের কৃষিকাজে ক্ষতি হয় এবং শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।[৪৭]

বীজবপনের বিধি সম্পর্কে তিনি বলছেন চন্দ্রের ক্ষয়কালে (কৃষ্ণপক্ষে), রিক্তা তিথিতে (চতুর্থী, নবমী এবং চর্তুদশতম দিন) বীজ বপন করা হবে না। এসকল বিধি মেনে যে কৃষক শস্য রোপণ করবে অবশ্যই তার কৃষিতে শস্যবৃদ্ধি হবে।[৪৮] বৃষরাশির (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের) শেষ ও মিথুনরাশির (আষাঢ়) আরম্ভের মধ্যবর্তী তিন দিন ধরণী ঋতুমতী হয়। এই সময়ে বীজ বপন বিধেয় নয়। এই নিয়মের অন্যথা করলে (সেই ব্যক্তি) পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[৪৯] বীজ রোপণের নিয়মাবলি সর্ম্পকে ১৮৫ নম্বর শ্লোকে বলেছেন কর্কটে (শ্রাবণে) এক হস্ত পরিমাণ দূরত্বে, সিংহে (ভাদ্রমাসে) অর্ধহস্ত এবং কন্যারাশিতে (আশ্বিনে) চার আঙুল পরিমাণ দূরত্বে রোপণ করতে হবে। এই বিধান সমস্ত শস্যের জন্যই বিধেয়। কর্কটরাশিতে ও ভাদ্র মাসে যদি

জমির আগাছা মোচন করা যায়, তবে পরে ঘাস জন্মালেও ধানের শস্য দ্বিগুণ ফলন হবে।[৫০] ২১২ নম্বর শ্লোকে তিনি নক্ষত্র অনুযায়ী ধানকাটা শুরু করার প্রকৃষ্ট দিন নির্দেশ করেছেন।

কৃষি বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা, কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও ঈশ্বর নির্ভরতা

আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতেই তিনি 'প্রজাপতি' কে প্রণাম করে কৃষকের কল্যাণে এই গ্রন্থ রচনা করার কথা বলেছেন। ঋষি পরাশর বলেছেন কৃষি পরিচালনায় মনোনিবেশ করলে সোনা ফলে এবং অমনোযোগী হলে দারিদ্র্য ডেকে আনে।[৫১] অধিকন্তু তিনি অন্য ঋষিদের উদ্ধৃত করে কৃষি বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন যেমন তিনি প্রত্যেক পরিবারের পিতাকে অন্তঃপুরের এবং মাতাকে রন্ধনশালার দায়িত্ব অর্পণ করার কথা বলেছেন।[৫২] কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যিক জ্ঞানের প্রয়োগে, স্ত্রীজাতি, রাজকীয় গৃহস্থালি প্রভৃতি পরিচালনায় মুহূর্তের অমনোযোগিতা তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ডেকে আনে, এজন্য জনগণের মঙ্গলের প্রতি মনোযোগী একজন সুদক্ষ ব্যক্তিরই কৃষিকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। কারণ অদক্ষ কৃষিজীবী দুর্দশা ডেকে আনে।[৫৩] যে কৃষক গরুর যত্ন করে, দৈনন্দিন চাষের কাজে যায়, সঠিক ঋতু চেনে, বীজের বিষয়ে যত্নশীল ও অনলস পরিশ্রমী, তিনি ধনাঢ্য হন এবং দুঃখ ভোগ করেন না।[৫৪] ভারবাহী পশু সম্পর্কে তিনি অনেকগুলো নির্দেশনা প্রদান করেছেন, পশুরা যেন চাষের নিমিত্তে নিপীড়িত না হয়, গুড় এবং পুষ্টিকর পশুখাদ্য প্রদান ও দুবেলা গোচারণ করলে পশুর কষ্ট লাগব হয় বলে মত দিয়েছেন[৫৫] এবং সুনির্মিত ও পরিচ্ছন্ন গোশালা নির্মাণের পাশাপাশি গোশালায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি গরুর পক্ষে ক্ষতিকর এরকম জিনিস বা পশু যেমন গোশালায় কাঁসার পাত্রে গাঁজলা ওঠা গরম জল বা মাছ ধোয়া জল রাখা, ঝাঁটা, নোড়া, পরিত্যক্ত বাসি খাবার রাখা ও ছাগল বেঁধে রাখতে নিষেধ করেছেন।[৫৬] গবাদি পশুর হিতার্থে ভুলবশত রবিবার, মঙ্গলবার ও শনিবারে গোময় স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[৫৭]

ঋষি পরাশর অনেকগুলো শ্লোকে চাষাবাদ ও কৃষিকাজের প্রধানতম অনুষঙ্গ গরুর পূজা করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে গরুর শিং-এ একটি শ্যামাগুল্ম বেঁধে ও গায়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে গোপূজা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৮] তিনি বলছেন-কার্তিকের প্রথম দিনে গবাদিপশুর অঙ্গে তেল ও হলুদ মিশিয়ে লেপন করবে এবং লৌহ উত্তপ্ত করে গরুর দেহে স্পর্শ করে লেজের অগ্রভাগে, কেশাগ্র ও কর্ণকেশের অগ্রভাগে কর্তন করবে। যে ব্যক্তি এরূপ উপাচার পালন করবে তার সমস্ত গো-পাল সংবৎসরে নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত থাকবে।[৫৯] ১৪১ নম্বর শ্লোকে কৃষিকাজের অনুপযুক্ত ষাঁড় সম্পর্কে তিনি বলছেন যে, নিতম্বভারে ক্লিষ্ট কিংবা লেজ বা কানকাটা অথবা সম্পূর্ণ সাদা কোন ষাঁড় কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযুক্ত।

সে সময় শস্য বা বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বলেই মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে রক্ষিত শস্যের কথা বলা হয়েছে।[৬০] রামাই পণ্ডিত শূণ্যপুরাণে লিখেছেন, শিব ধানচাষের প্রয়োজনে বীজধানের জন্য দেবী দূর্গার শরণাপন্ন হন।[৬১] এসব বিবরণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন যুগে বীজ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল। শস্যবীজ সংরক্ষণের ব্যাপারে *কৃশি-পরাশরে*ও স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। ১৬৮ ও ১৬৯ নম্বর শ্লোকে পরাশর লিখছেন বীজকে উচ্ছিষ্ট/অবশিষ্ট খাদ্য, ঘি, মাখন, তেল, লবণ, ঋতুমতী স্ত্রীলোক, বন্ধ্যা, সদ্যপ্রসূতি এবং গর্ভিণীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ১৮১ নম্বর শ্লোকে তিনি অধিক ফসল প্রাপ্তির জন্য সব বাধা দূরীকরণের নিমিত্তে বীজ বপন শেষে বপনক্ষেত্রে ঘি-যুক্ত অন্ন ও পায়সান্ন ভক্ষণ করতে বলেছেন।

সমকালীন কৃষিতে প্রযুক্তির উত্তম প্রয়োগ বিভিন্ন উৎস মারফত জানা যায়, শূন্যপুরাণের "অথ চাস" অধ্যায়ে ধানচাষের প্রস্তুতির জন্য পণ্ডিত, ফাল, জোয়াল, মই প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৬২] কৃষিবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে কৃষি ছিলো 'খুন্তিভিত্তিক', দ্বিতীয়ধাপে তা 'লাঙলভিত্তিক' কৃষিতে উন্নীত হয়। তৃতীয় ধাপে হলো লাঙলে লোহার ফাল সংযোজন।[৬৩] *কৃষি-পরাশরের*

অসংখ্য শ্লোকে কম পরিশ্রমে অধিক ফলনের জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রে কৃষির অধিক ফলনের জন্য দেবতা ও ঈশ্বর নির্ভরতার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। কৃষিতে আলোচ্য সময়ের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি হল লাঙল। *কৃষি-পরাশরে* বিভিন্নভাবে লাঙ্গলের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নিকট অতীত পর্যন্ত দুইটি পশু দ্বারা চালিত লাঙ্গলের উল্লেখ সর্বজনীন। উদাহরণ হিসেবে সোমপুর বিহার ও রাণিমাতার টেরাকোটায় খোদিত পণ্ডিত দ্বারা কৃষকের ভূমি-কর্ষণের দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৬৪] কিন্তু *কৃষি-পরাশরে* বলা হয়েছে আটটি ষণ্ড দিয়ে পণ্ডিত টানা উচিত, যদিও সাধারণ কৃষকেরা ছয়টি ব্যবহার করে। নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা চারটি ব্যবহার করে, কিন্তু দুটির ব্যবহার গোহত্যার শামিল।[৬৫] ঋষি পরাশর আরও জানাচ্ছেন যে- চাষাবাদে দশটি পণ্ডিত ব্যবহার করলে ধনলক্ষ্মী অটুট থাকেন, পাঁচটির ব্যবহারে ধনলাভ হয়, তিনটির দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন হয় এবং একটিতে ঋণের বোঝা বাড়ে। দুটি লাঙলের ব্যবহারে কোনোক্রমে এক জনের দিন গুজরান হয় এবং তিনি পূর্বপুরুষ, দেবতা ও অতিথি সৎকারে অপারগ হন।[৬৬] ১১২ থেকে ১২০ নম্বর শ্লোকে তিনি লাঙলের আটটি যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বিবরণসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে লাঙ্গলের যন্ত্রাংশগুলোর নাম হচ্ছে ঈষা, যুগ, হলস্থাণু, নির্জোল, পাশিকা, আদ্যকলা, শৌ ও পচ্চনি।[৬৭] এই আটটি যন্ত্রাংশ লাঙ্গলের বিবর্তনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এ থেকে ধারণা করা হয় *কৃষি-পরাশরে* বর্ণিত লাঙল তৃতীয় ধাপের। গরুর গোবর আধুনিক সময়ের জমিতে উর্বরতা বৃদ্ধিকারী একটি উত্তম জৈব সার হিসেবে বিবেচিত, ঋষি পরাশর সার হিসেবে গরুর গোবরের ব্যবহারবিধি এবং এর গুণাগুণ সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে-গোময় রোদে শুকিয়ে চূর্ণ করার পর সেই সার ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক ক্ষেতে নির্দিষ্ট গর্তে জমিয়ে রাখতে হয়, বীজ বপনের সময় সেই সার বাইরে বের করতে হয় কারণ সার ছাড়া ধান গাছে ফলন হয় না।[৬৮] তিনি বলছেন হেমন্তের কর্ষিত মাটি সোনা ফলায়, বসন্তের কর্ষিত মাটি তামা বা রূপা ফলায়, বর্ষার প্রারম্ভে কর্ষিত জমি দারিদ্র্য ডেকে আনে।[৬৯] এর মাধ্যমে তিনি উল্লিখিত ধাতুসমূহের মূল্য বিবেচনার আলোকে কোনো ঋতুতে ফসল বপন করলে অধিক ফলন পাওয়া যায় সেটার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন ।

শস্যবীজ সংরক্ষণ বিধি সম্পর্কে একগুচ্ছ শ্লোকে তিনি নির্দেশনা প্রদান করছেন, মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সব বীজ সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুষ্ক করার কথা বলেছেন এবং তুষ ঝেড়ে শস্যবীজকে ক্ষুদ্র থলিতে ভরে রাখতে বলেছেন কেননা তুষমিশ্রিত বীজ শস্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর।[৭০] সমাকৃতির বীজ রোপণ করলে শস্যের প্রাচুর্য হয়, এজন্য তিনি সমাকৃতির বীজ তৈরির জন্য কৃষককে যত্নবান হতে বলেছেন।[৭১] কিন্তু সমাকৃতির বীজ তৈরির সময় সতর্কতার সাথে বাড়তি অংশ কেটে বাদ দিয়ে বীজ শক্ত করে পুঁটুলি বেঁধে রাখতে হবে, নচেৎ তা থেকে গাছ বেড়ে যাবে এবং উইঢিবির উপর অথবা গোয়াল ঘরে অথবা আঁতুড় ঘরে কিংবা বন্ধ্যা নারীর গৃহে বীজ রাখা যাবে না।[৭২] গার্গ্যকে উদ্ধৃত করে পরাশর আরও বলছেন, যে-বীজ বর্তিকা, অগ্নি বা ধূমের স্পর্শে এসেছে, বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা আবৃত অবস্থায় কোনো গর্তে রক্ষিত হয়েছে বা মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে-তা ভুলক্রমেও বপন করা যাবে না।[৭৩] শুধু তিল, ধান্য ও যব তিন শস্যের বিষয়ে এই নিয়মগুলি প্রযোজ্য তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় সু-ফসলের মূল হল উত্তম বীজ।[৭৪]

বীজ বপনের শ্রেষ্ঠ সময় হল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মধ্যম, আষাঢ় মন্দ আর শ্রাবণে বীজ বপন অধমেরও অধম আর রোপণের নিমিত্তে বীজ বপনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল আষাঢ়, শ্রাবণ মধ্যম এবং ভাদ্র অধম।[৭৫] বপন ও রোপণের ক্ষেত্রে দুটি দিন বাদ দেয়া বিধেয়, মঙ্গলবারে ইঁদুরের ভয় আর শনিবারে পঙ্গপাল ও অন্যান্য পতঙ্গের ভয়। অতঃপর বীজ বপনের পর শস্যক্ষেত্রে মই প্রয়োগ করতে হবে, এটি না করা হলে ক্ষেতের সর্বত্র সমভাবে বীজ অঙ্কুরিত হবে না।[৭৬] রোপণের জন্য ঋষি পরাশরের নির্দেশনা হচ্ছে পূর্ণবয়স্ক ধান্যচারা থেকে কখনও রোপনের জন্য চারা সংগ্রহ করবে না। যে চারা কেদারে (ক্ষেতের মাটিতে) দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে তাকে উৎপাটিত করে রোপন করলে তা ফলদায়ী হয় না। শ্রাবণে একহস্ত পরিমাণ দূরত্বে, সিংহে অর্ধহস্ত এবং কন্যারাশিতে চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরত্বে রোপন করতে হবে। এই

বিধান সমস্ত শস্যের জন্য বিধেয়।[৭৭] যে কৃষক আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধানক্ষেতে নিড়ানির জন্য উদ্যোগী হবে সে বুদ্ধিমান। যে ধানক্ষেতে নিড়ানি হয়নি, সেখানে বীজের সমপরিমাণ ফসলই হবে তবে যে জমি নিচু সেখানে নিড়ানি এবং সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।[৭৮] অতএব কৃষিক্ষেত্রকে সযত্নে ও যথাসময়ে আগাছা ও তৃণমুক্ত রাখতে হবে। তবেই কৃষক মনমতো ফসল লাভ করবে।[৭৯]

ধানকে রোগমুক্ত রাখার জন্য ভাদ্র মাসে ক্ষেতে জমা জলের নিকাশি করতে হবে, এই সময়ে কেবল শিকড় পর্যন্ত জল রক্ষা করা বিধেয়। কৃষিক্ষেত্রে ভাদ্রমাসে জল জমা থাকলে ধানগাছে নানাবিধ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এবং কৃষক তার আশানুরূপ শ্রেষ্ঠ ফসল পায় না।[৮০] আশ্বিন, কার্তিক এবং শরৎকালে তিনি জল সংরক্ষণ করার কথা বলেছেন।[৮১]

পূর্বেই বলা হয়েছে জ্যোতির্জ্ঞান, লৌকিক কথনের পাশাপাশি *কৃষি-পরাশরে* দেবতা এবং ঈশ্বরনির্ভরতার উপর অনেকগুলো শ্লোক রয়েছে। *কৃশি-পরাশর* গ্রন্থটির শুরু-ই হচ্ছে 'প্রজাপতি'কে প্রণাম করে। পরাশর কৃষিকাজকে দেবতার আর্শিবাদপুষ্ট এবং পবিত্র কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে গোশালায় সন্ধ্যাপ্রদীপ না দিলে গোকুল অশ্রুবর্ষণ করে ফলে ধনলক্ষ্মী বিরূপ হন।[৮২] মাঘ মাসে শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনা করে কোনো শুভ দিন এবং শুভ নক্ষত্রে গোময় উত্তোলন করতে হয়। হল প্রসারণ সেকালের এক জনপ্রিয় উৎসব ছিলো, সূর্য ও চন্দ্রের শুভ স্থানে অবস্থান কালে স্নান করে এক জোড়া সাদা কাপড় পরিহিত হয়ে চন্দন ও ফুলসহ দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে পৃথিবী, নক্ষত্রাদি, পৃথু এবং প্রজাপতির পূজা করে ও ব্রাহ্মণগণকে অর্ঘ্য নিবেদন করার পর লাঙ্গলের ফলায় মধু মাখিয়ে ও স্বর্ণ স্পর্শ করে বাম দিকে সর্পকুণ্ডলী স্থানে হল প্রসারণ উৎসব পালন করা হয়।[৮৩] বাসব (ইন্দ্র), শুক্র, পৃথু এবং ঋষি পরাশরকে মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা আবাহন করতে হবে। অগ্নি, দ্বিজ এবং ঈশ্বরের আরাধনা করে হল প্রসারণ উৎসব পালন করতে হবে। বৃষ্টির অভাবে সেচের প্রয়োজনীয়তা হলে উত্তম মুখে উপবিষ্ট হয়ে দুধ, ময়দা ও ক্ষীর সহযোগে প্রস্তুত নৈবেদ্য প্রদান করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে 'প্রভু নৈবেদ্য গ্রহণ করুন, উত্তম বৃষ্টিপাত দান করুন'।[৮৪] ধর্মপ্রাণ কৃষক একাগ্রচিত্তে হাঁটুদ্বয় মাটিতে রেখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে ইন্দ্রের আরাধনা করে মন্ত্রোচ্চারণ করবেন 'প্রভু আপনার কাছে বিনত হই, বাধামুক্ত করে ধনধান্যে সম্পদশালী করুন'।[৮৫] শস্যের পর্যাপ্ত ফলনের জন্য মেঘসহ বাতাসের দেবতাকে অবশ্যই ঘিয়ের প্রদীপসহ নৈবেদ্য নিবেদন করতে হবে। তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে 'অভ্যন্তরে স্বর্ণভান্ডার সমৃদ্ধ, শেষনাগের উপর শায়িত এবং প্রাণী ও জড়বস্তুসমূহের ধাত্রী, হে ধরিত্রীমাতা আমাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন'।[৮৬] ধানকে রোগমুক্ত করার জন্যও তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন, 'ওঁ সিদ্ধি গুরুপদে প্রণাম...' এই মন্ত্র অলক্তক দ্বারা লিপিবদ্ধ করে ক্ষেত্রমধ্যে রক্ষিত হলে, সেই ক্ষেত্র (ধানের) রোগ, কীট অথবা পশু ভয় থেকে মুক্ত থাকে।[৮৭] অতঃপর পৌষ মাসের শুভ দিনে অকর্তিত ধান্যক্ষেত্রের কাছাকাছি লোকেরা একত্রিত হয়ে পুষ্যাযাত্রা করবে এবং পূষ্প আভরণে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রদেবকে নমস্কার করে নৃত্যগীত বাদ্যাদিসহ মহা উৎসবে রত হবে।[৮৮] অখণ্ডিত ধান্যময় এই ক্ষেতে পুষ্যাযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা সকলে, হে শুভ প্রদানকারী দেবী, আমরা সকলে তোমার প্রসাদ চাই।[৮৯]

সামাজিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে *কৃষি-পরাশর* এর নৈর্ব্যক্তিকতা এবং কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক ইতিহাস

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে কৃষির ইতিহাস পুনর্গঠন করা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস কি রাজনৈতিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক; পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে প্রাপ্ত কপারপ্লেটস বা তাম্রশাসনসমূহ। সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মীয় সংগঠন/ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধর্মাচরণের ক্ষেত্র তৈরির জন্য ভূমিদান চুক্তি তামার পাতের ওপর দলিল আকারে বিস্তারিত লেখা হতো।[৯০] কিন্তু এই তাম্রশাসন গুলো বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। এর সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে ভূমিদানকারী রাজার স্তুতি। যদিও এক রাজবংশ থেকে অন্য রাজবংশের তাম্রশাসনগুলোতে কাঠামোগত

কিছু পার্থক্য গোচরীভূত হলেও অধিকাংশ কপারপ্লেট একটা অভিন্ন নমুনা অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যদি পালদের তাম্রফলকের খোদাই শৈলী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শুরুতেই ধর্মীয় বিষয়াদি, গৌতম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জ্ঞাপক কিছু শ্লোক, তারপর ভূমিদানকারী রাজার স্তুতিসূচক কিছু বাক্য যেমন 'পরমভট্টারক, পরমেশ্বর বা মহারাজাধিরাজ' ইত্যাদি এবং তাঁর রাজধানীর বর্ণনা ও সেসময়কার পদস্থ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীদের পদবি উল্লেখ করে মূল বিষয় তথা জমির অবস্থান, জমির বিবরণ, কেন দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন সেগুলো শেষের দিকে লিপিবদ্ধ হতো। আর সাহিত্যিক উপাদান এর অপ্রতুলতা বা যা আছে সেগুলো রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হওয়ায় এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে অন্যান্য উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান থাকায়; প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক ইতিহাস রূপায়নে *কৃষি-পরাশরের* ভূমিকা অপরিসীম। এখানেও ধর্মীয় উপাদান থাকলেও সেটা আবহমান কাল ধরে বাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্যোতির্জ্ঞান, কৃষিবিষয়ক নানা বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশনা, প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস-প্রথা-উৎসব, কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তির আলোচনা *কৃষি-পরাশরকে* বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস তথা কৃষি ইতিহাস পুনর্গঠনের এক অনবদ্য উৎসের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

বাংলার পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে কিছু তথ্য এই গ্রন্থ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে, অন্যান্য ঋষিগণকে উদ্ধৃত করে তিনি লিখছেন 'প্রত্যেকেরই তার পিতাকে অন্তঃপুরের এবং মাতাকে রন্ধনশালার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত'।[৯১] *কৃষি-পরাশর*-এর অনেকগুলো শ্লোকে আমরা সে সময়ে ব্যবহৃত মূল্যবান ধাতুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারছি। এই গ্রন্থে তামা, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিমাণিক্যর কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং এগুলো হাত-কান-গলায় তারা পরিধান করত।[৯২] বাঙালি জাতি *ঐতিহাসিকভাবেই* অতিথিপরায়ণ, *কৃষি পরাশরের* ৯ নং শ্লোকে বলা হচ্ছে 'যিনি অতিথিসেবা করেন বাস্তবিক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর সম্মানে সকলে সম্মানিত হন এবং ঈশ্বরপূজাও হয়।

ঋষি পরাশর এই গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য শ্লোকে সমকালীন অনেক পশু-পাখি, ফল-ফুল, খাবার-দাবার এবং গাছপালার কথা উল্লেখ করেছেন। পশু-পাখির মধ্যে ইঁদুর, গরু, পিপীলিকা, ব্যাঙ, বিড়াল, নকুল, সাপ, হনুমান, মথ, ময়ূর, ঝিঁঝিঁপোকা, পঙ্গপাল, ছাগ, শূকর, হরিণ, মহিষ, চড়ুই, টিয়া উল্লেখযোগ্য। ফল-ফুল-গাছ-গাছালির মধ্যে কুন্দফুল, গন্ধচন্দন, ডুমুর, আম, বট, সপ্তপর্ণী, শাল্মলী, গম্ভারী, নিম, সর্ষে, কপিত্থ, বিলু, বাঁশ, নারকেল, আগাছা এবং ঘাস উল্লেখযোগ্য। ফসলের মধ্যে আমরা মাসকলাই, তিল, ধান্য ও যব এর নাম পাচ্ছি। খাবার-দাবারের মধ্যে ঘি যুক্ত অন্ন, হিং মরিচ সহযোগে প্রস্তুত অতি উত্তম নিরামিষ ব্যঞ্জন মৎস্য-মাংস ও পরমান্ন সহযোগে দধি, দুধ তথা দুগ্ধজাত অন্যান্য সামগ্রী ও পায়েস, নানান ফলমূল সহ প্রচুর মিষ্টান্ন যা কলাপাতার উপর পরিবেশন করা হতো তার কথা পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষি-পরাশর গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত হল-প্রসারণ উৎসব সম্পর্কে প্রাণবন্ত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, এটা মূলত কৃষি বছরের শুরুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে লাঙল চালনা করার উৎসব। এই উৎসব কোন সময়ে, কিভাবে পালন করা হয় তাঁর বিবরণ তিনি সবিস্তার লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি আরও দুটি উৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন তার একটা হচ্ছে 'বালপ্রসন্ন', তিনি বলেছেন, কর্কট ও মকর রাশিস্থিত 'বালপ্রসন্ন' অনুষ্ঠান না করলে কৃষক সুফলের আশা করতে পারে কি? আরও বলেছেন, যদি কৃষক বালপ্রসন্ন অনুষ্ঠান না করে কেবল আত্মগর্বী শক্তির সাহায্য কৃষিকাজ করে তবে তা বিফল হয়। আর একটা হচ্ছে পুণ্যাহ বা শুভদিন পালন করা।[৯৩]

কৃষি পরাশর যে বাংলার ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক তথ্য সংযোজন করেছে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আবহমান কাল থেকে বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান জনপদ। সুতরাং এর অধিবাসীদের ধ্যান-জ্ঞান, কর্মকাণ্ড সব ছিল কৃষিকেন্দ্রিক। বাংলার প্রথম আধুনিক আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার একটা বড়

অংশ বলেছিল তাদের ধর্ম কৃষি।[৯৪] কৃষিকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থা আবর্তিত হত। এজন্য সমকালীন কৃষিকে জানার বিকল্প নেই, কৃষির ইতিহাস জানা মানেই তখনকার ইতিহাস জানা, মানুষের ইতিহাস জানা, তখনকার সমাজ-সংস্কৃতিকে জানা। ইতিহাসের নতুন পাঠধারায় কৃষিকেন্দ্রিক গ্রন্থসমূহের গুরুত্ব বাড়ছে, কেননা এখনকার গবেষকরা মানুষের ইতিহাস পুনর্গঠনে বেশি আলোকপাত করছেন। সুতরাং নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য, জানানোর জন্য *কৃষি-পরাশর* গ্রন্থটি আরও বৈজ্ঞানিক এবং নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ১৩

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৬

৩. 'পাণ্ডুরাজারঢিবি', www.bn.banglapedia.org; বিস্তারিত দেখুন; Paresh Chandra Dasgupta, *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi* (Calcutta: Directorate of Archeology, 1962), p. 14

৪. Dines Chandra Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization* (Calcutta: University Press, 1965), Vol. I, p. 79.

৫. দেখুন- কালিদাস, *রঘুবংশম* (কলিকাতা: কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ), গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পা.।

৬. R.C Mojumdar, Radhagovinda Basak & Nanigopal Banerji, *The Ramacaritam of Sandhyakarnandin* (Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939).

৭. দেখুন R. Shamasastry (tran.), *Kautilya's Arthasastra* (Mysore: Arjun Publishing House, 2019.

৮. নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ৬৬

৯. লক্ষণ সেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনের ৪র্থ ও ১ম লাইনে এবং কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনের ২৪ নং লাইনে দেখুন। Also see Nani Gopal Majumdar (Ed. with translation and nots), *Inscription of Bengal* (Rajshahi: Varendra Research Library, 1929), pp. 88-90 & 129.

১০. বিস্তারিত দেখুন: 'Introduction', *Krisi-Parasara* (Ed. and Trans. by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji), (Calcutta: Asiatic Society, 1960), p. v-xviii.

১১. Lallanji Gopal, *The Economic Life of Northern India c. A.D. 700–1200* (Delhi: Motilal Banarsidas Publishers, 1989), pp. 283–313.

১২. A.K Choudhary, *Early Medieval Village in North-Eastern India: A.D. 600–1200* (Calcutta: Punthi Pustak, 1971).

১৩. Gula Wojtilla, "*Kāśyapīyakrsisūkti: A Sanskrit work on agriculture I* " , Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung., Vol. 33:2, Akademiai Kiado, 1979, pp. 209–52.

১৪. Ryosuke Furui, "The Rural World of an Agricultural Text: A Study on the Krsiparāśara", *Studies in History*, Volume: 21 issue: 2, JNU, 2005, pp. 149-17.

১৫. কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, "*প্রাচীন ভারতে খাদ্যাভ্যাস-একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা*" *(পিএইচডি অভিসন্দর্ভ*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০), পৃ. ২০

১৬. Pandurang Vaman Kane, *History of Dharmasastra* (Pune: Bhandarkar Oriental Reserach Institute, 1968), Volume 1, part 1, p. 276.

১৭. যোগেশচন্দ্র রায়, *আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (*কলকাতা: শ্রীকেদারনাথ বসু বি.এ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৩), প্রথম ভাগ ।

১৮. Ed. and Trans. by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji, *op. cit.*, p. IX.

১৯. Lallanji Gopal, *op. cit.*, pp. 283-313.

২০. Ryosuke Furui, *Studies in History*, 2005, p. 151.

২১. *Krisi-Parasara*, verse 1.

২২. *Krisi-Parasara*, verse 5.

২৩. *Krisi-Parasara*, verse 8 &10.

২৪. শাহীনুর রশীদ, *"কৃষি-প্রযুক্তি" বাংলাদেশের ইতিহাস* (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত), আবদুল মমিন চৌধুরী সম্পা. (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯), পৃ. ১৮৬ ও ১৮৭।

২৫. *Krisi-Parasara*, verse 23.

২৬. *Krisi-Parasara*, verse 26.

২৭. *Krisi-Parasara*, verse 29.

২৮. *Krisi-Parasara*, verse 72.

২৯. *Krisi-Parasara*, verse 73.

৩০. *Krisi-Parasara*, verse 74.

৩১. *Krisi-Parasara*, verse 65.

৩২. *Krisi-Parasara*, verse 67.

৩৩. *Krisi-Parasara*, verse 66.

৩৪. *Krisi-Parasara*, verse 68.

৩৫. *Krisi-Parasara*, verse 69 & 70.

৩৬. *Krisi-Parasara*, verse 75.

৩৭. *Krisi-Parasara*, verse 27-78.

৩৮. *Krisi-Parasara*, verse 85.

৩৯. *Krisi-Parasara*, verse 105.

৪০. *Krisi-Parasara*, verse 106.

৪১. Ed. and Trans. by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji, *op. cit.* p. 75.

৪২. *Krisi-Parasara*, verse 127.

৪৩. *Krisi-Parasara*, verse 128.

৪৪. *Krisi-Parasara*, verse 129.

৪৫. *Krisi-Parasara*, verse 144.

৪৬. *Krisi-Parasara*, verse 145 & 145.

৪৭. *Krisi-Parasara*, verse 147-149.

৪৮. *Krisi-Parasara*, verse 173.

৪৯. *Krisi-Parasara*, verse 175.

৫০. *Krisi-Parasara*, verse 190.

৫১. *Krisi-Parasara*, verse 79.

৫২. *Krisi-Parasara*, verse 80.

৫৩. *Krisi-Parasara*, verse 81 & 82.

৫৪. *Krisi-Parasara*, verse 83.

৫৫. *Krisi-Parasara*, verse 86.

৫৬. *Krisi-Parasara*, verse 87, 90, 91, 95.

৫৭. *Krisi-Parasara*, verse 93.

৫৮. *Krisi-Parasara*, verse 99.

৫৯. *Krisi-Parasara*, verse 102-104.

৬০. Dines Chandra Sircar, *op. cit.* p. 79.

৬১. রামাই পণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ*, অথ চাস: ২৭ (চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পা. ও নিমাইচন্দ্র পাল সংকলিত) (কলকাতা: ১৪২০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১২৩ ও ১২৪

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. শাহীনুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

৬৪. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর* (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ১৯৯৭), পৃ. ১০৯; তোফায়েল আহমেদ দেওয়ান, "রাণীর বাংলো ঢিবিতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক", *প্রত্নচর্চা*-২, ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ২০০৮), পৃ. ৭৫ ও ৮০

৬৫. *Krisi-Parasara*, verse 96.

৬৬. *Krisi-Parasara*, verse 97 & 98.

৬৭. লাঙলের অংশসমূহের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মো. শাহিনুর রশীদ, "ঋষি পরাশরের পণ্ডিত: স্বরূপ অন্বেষ", *ইতিহাস অনুসন্ধান* ৩৩ (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৯), পৃ. ৭৭-৯৩; Gyula Wojtilla, 'New Light on the Verse 112 of the Kṛṣiparāśara', *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, Vol. 54, No. 2/3 (2001), pp. 187-189.

৬৮. *Krisi-Parasara*, verse 110 & 111.

৬৯. *Krisi-Parasara*, verse 156.

৭০. *Krisi-Parasara*, verse 158.

৭১. *Krisi-Parasara*, verse 159.

৭২. *Krisi-Parasara*, verse 160-161.

৭৩. *Krisi-Parasara*, verse 164 & 165.

৭৪. *Krisi-Parasara*, verse 167.

৭৫. *Krisi-Parasara*, verse 168 & 169.

৭৬. *Krisi-Parasara*, verse 182.

৭৭. *Krisi-Parasara*, verse 185.

৭৮. *Krisi-Parasara*, verse 186.

৭৯. *Krisi-Parasara*, verse 192.

৮০. *Krisi-Parasara*, verse 193 & 194.

৮১. *Krisi-Parasara*, verse 196 & 197

৮২. *Krisi-Parasara*, verse 130-132.

৮৩. *Krisi-Parasara*, verse 130-132.

৮৪. *Krisi-Parasara*, verse 133-136.

৮৫. *Krisi-Parasara*, verse 137 & 138.

৮৬. *Krisi-Parasara*, verse 139 & 140.

৮৭. *Krisi-Parasara*, verse 194 & 195.

৮৮. *Krisi-Parasara*, verse 221 & 227.

৮৯. *Krisi-Parasara*, verse 229.

৯০. 'তন্ত্রশাসন' , *www.bn.banglapedia.org*

৯১. *Krisi-Parasara*, verse 80.

৯২. *Krisi-Parasara*, verse 4 & 5.

৯৩. *Krisi-Parasara*, verse 152 , 153, 178 & 80.

৯৪. "Census of Bengal, 1881, " Journal of the Statistical Soceity of London, 46, No. 4, London, 1883, pp. 680-90.